সপ্তপদী

সপ্তপদী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

॥ এক ॥

ছ-ফুট লম্বা একটি মানুষ। হয়ত ইঞ্চি দুয়েক বেশিই হবে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মনে হয় দেহ যেন কিছু শীর্ণ, কিন্তু দুর্বল বা রোগজীর্ণ নয়। কালো রঙ, বাঙলাদেশের কালো রঙ; মাজা কালো। প্রশস্ত ললাট, লম্বাটে মুখখানির মধ্যে বড় বড় দুটি বিষণ্নদৃষ্টি চোখ। বিষণ্নতা ছাড়াও কিছু আছে, যা দেখে মনে হয়, লোকটির মন বাইরে থাকলে অনেক দূরে আছে, ভিতরে থাকলে অন্তরের গভীরতম গভীরে মগ্ন।

পাগলা পাদরী। এই নামেই ব্যক্তিটি পরিচিত এ-অঞ্চলে। অঞ্চলের লোকের দোষ নেই, এর চেয়ে ভালভাবে লোকটির স্বরূপ ব্যক্ত করা বোধ হয় যায় না। পরনে পাদরীর পোশাক, কিন্তু সে-পোশাক গেরুয়ায় ছোপানো, যা ভারতবর্ষের বৈরাগ্য-ধর্মের চিরন্তন প্রতীক। এ-অঞ্চলের কোনো গির্জার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নন। কোনো ধর্মও প্রচার করেন না। শুধু চিকিৎসা করে বেড়ান। পাগলা পাদরী খুব ভাল ডাক্তার। বাইসিক্লে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে রোগী খুঁজে বেড়ান। পথের দু-পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কী মহাশয়গণ, কেমন আছ গো সব? ভাল তো?' সঙ্গে সঙ্গে মুখভরা মিষ্টি হাসি উপচে পড়ে।

'হ্যাঁ বাবা, ভাল আছি।'

'আচ্ছা! আচ্ছা! খুব ভাল। ভাল থাকো। মানুষ ভাল থাকলেই ভগবান ভাল থাকেন গো! জয় ভগবান!' বলেই এগোতে থাকেন। লম্বা মানুষের পা-দুখানাই বেশি লম্বা; কথা বলবার সময় বাইসিক্ল থেকে নামেন না—পা-দুখানা প্যাডেল থেকে নামিয়ে দেন মাটির

উপর; চলবার সময় মাটি থেকে তুলে প্যাডেলে রেখে একটু ঝোঁক দিয়ে চাপ দেন—চলতে থাকে বাইসিক্ল। যে-কোনো লোকের বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে সে পাগলা পাদরীর প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়েই থাকে। কতক্ষণে কখন শোনা যাবে বাইসিক্লের ঘণ্টা, কখন দেখা যাবে সাইক্লের উপর গেরুয়া পোশাক-পরা পাদরীকে। দেখলেই হাত তুলে আগে থেকেই বলে, 'বাবাসাহেব!'

ছ-ফুট লম্বা মানুষটি বাইসিক্ল থেকে মাটির উপর পা নামিয়ে দেন। নামতে হয় না। 'কী খবর? কার কী হল?'

'জ্বর।'

'কার?'

'আমার ছেলের।'

'চলো; দেখি কী হইছে। জ্বরটা কেমন, বাঁকা না সোজা? কী মনে লাগছে বলো দেখি?'

রোগী দেখেন, দেখেশুনে বাইসিক্লের পিছনে বাঁধা ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ দেন। কিংবা বলেন, 'আমার ওখানে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এসো।' না হয় বলেন—'ইটা বাবু দোকান থেকে আনতে হবেক। আমার ভাঁড়ারে নাই।' লিখে দেন কাগজে।

বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যে-রাস্তাটা—পুরীর পথ বলে খ্যাত—বিষ্ণুপুরের কোল ঘেঁষে মেদিনীপুর হয়ে চলে গেছে সমুদ্রতট পর্যন্ত, যার সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে কয়েকটা রাস্তাই মিলেছে, তারই ধারে তাঁর মিশন; না, মিশন নয়—আশ্রম।

শালবন আর গেরুয়া মাটির দেশ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়িয়া নদী। বীরাবতী-শিলাবতী-দারুকেশ্বর, বীরাই-শিলাই-দারকা। মধ্যে মধ্যে লালচে পাথর, নুড়ি ছড়ানো অনুর্বর প্রান্তর খানিকটা। এই ধরনের ভূ-প্রকৃতি একটা ঢাল নামার মত নেমে ছড়িয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আবার এরই দু-ধারে বাঙলার কোমল ভূমির প্রসার। সেখানে জনসমৃদ্ধ গ্রাম, শস্যক্ষেত্র।

উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও আরণ্য-ভূমের রেশ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তভোগ থেকে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ফালির মত ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ক্রমশ। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলগুলি ইতিহাস-বিখ্যাত। পাথুরে কাঁকুরে এই আঁকাবাঁকা শালজঙ্গল-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে গ্রামগুলি, সেগুলিতে প্রাচীন আমলের সেই মানুষদের বংশধরেরা বাস করে। বাউরি, বাগ্দী, মেটে, মাল, খয়রা, সাঁওতাল। এদেরই মধ্যে সামন্তযুগে প্রধান হয়ে বসেছিল উত্তর ভারতের ছত্রীরা। সিংহ, রায় প্রভৃতিরা। কয়েকখানা গ্রামের পরে পরে এমনই এক-একটি পরিবার আজ এক-একটি বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। লেগেই আছে মামলা-মকদ্দমা, দেওয়ানী ফৌজদারী। ঘোর কালো রঙের পীতচক্ষু অভাবশীর্ণ অর্ধনগ্ন মূক মানুষগুলির মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ দীর্ঘাকৃতি উগ্র প্রকৃতির মানুষগুলি বিচিত্রভাবে মিশে রয়েছে। এক-একটি ছত্রীবাড়ির নাম আজও রাজবাড়ি। এ-রাজবাড়ির ভাঙা দেওয়াল, মাটির উঠান, জীর্ণ খড়ের চাল; রাজার পরনে ময়লা জীর্ণ কাপড়, খোলা গা, বসে বিড়ি খান, অথবা হুঁকো টানেন; পরস্পরের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে কটু ভাষায় কলহ করেন। রাণী-রাজকন্যা নিজেদের হাতেই রান্নাবান্না করেন, নিজেরাই কাঁখে বয়ে জল আনেন, ধান মেলে দেন পায়ে-পায়ে। উঠান নিকানো, বাসন মাজা, এ-সব এখনও ওই কালো রঙের মানুষদের বাড়ির মেয়েরা করে। পুরুষেরা জমি চষে, গরু চরায়, জঙ্গল থেকে কাঠ কাটে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-আধ ঘর দলপতি বা লায়েক-বাগ্দীর বাস আজও আছে। দলপতি লায়েক এদের উপাধি। এরা এককালে ছত্রী সামন্তদের অধীনে ছিল যোদ্ধা সর্দার। সামন্তদের দেওয়া নিষ্কর জঙ্গলমহলে জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামের মধ্যে আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং অনুচরদের নিয়ে মদ্যে মাংসে, মোটা লাল চালের ভাতে, দুর্দান্ত সাহসে, শিকারে, আর সন্ধ্যায় মাদলের সঙ্গে নাচে গানে জীবনযাপন করত। পাঠান-মোগলের যুদ্ধের কাল থেকে এদের কথা আর প্রবাদ বা কাহিনী নয়, ইতিহাস। মোগলদের শেষ আমলে, মারাঠা

অভিযানের সময় এরা রীতিমত লড়াই করেছে। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে গাছের উপর চড়ে তীর ছুড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরেছে। তাড়া খেয়ে বাস-বসতি ফেলে নিবিড় জঙ্গলে লুকিয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় কোম্পানির ফৌজের সঙ্গেও খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। সামন্ত রাজারা আনুগত্য স্বীকার করার পরও এরা, এই সর্দারেরা, লড়াই করেছে।

বাগ্দী-সর্দার গোবর্ধন দলপতি যে লড়াই করেছিল কোম্পানির দপ্তরে তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আছে। গোবর্ধন দলপতি নিজের অধিকারের সীমানা রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকে নি, কোম্পানির সীমানা কেড়ে নিয়ে দখল করেছিল। তার বাইরে এসেও দিনে-দুপুরে গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে, গ্রামের রাস্তায় মানুষের মাথা কেটে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এদেরই এক-আধ ঘরের দেখা আজও মেলে।

সমতলভূমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-নবশাক-প্রধান গ্রামগুলি এদের থেকে একটু দূরে। ওসব গ্রামেও বাগ্দী, বাউরি, মেটে, মাল আছে। তাদের চেহারা যেন কিছু আলাদা। রক্তের উত্তাপ এবং ঘনত্বেও বোধ হয় তফাত আছে।

শালবনে ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য এদের আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। শালের সঙ্গে আছে পলাশ আর মহুয়া। পলাশফুলের গুঁড়ো দিয়ে আজও কাপড় রঙ করে এরা; মহুয়া থেকে মদ চোলাই করে। মধ্যে মধ্যে আবগারী পুলিশ হানা দেয়—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধরতে পারে না; বিস্তীর্ণ শালবনের মধ্যে কোথায় যে ঘাঁটি, সে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। ধরা ক্বচিৎ পড়ে। ধলা পড়ে জেল খাটে, কিন্তু সে ওদের কাছে বিশেষ কিছু না। মধ্যে মধ্যে শিকারে বের হয়। অবশ্য সাঁওতালেরা এ-ক্ষেত্রে বেশি। কিন্তু এরাও বের হয়ে পড়ে। ময়ূর, বনমোরগ, তিতির, খরগোশ, হরিণ, বরা, ভালুক মেরে পায় বিপুল উল্লাস। বিশেষ করে বরা-ভালুকের উৎপাত হলে